BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY

DHANBAD , JHARKHAND

SYNOPSIS

OF

THE PROPOSED RESEARCH WORK FOR PH.D DEGREE

2020

গবেষণার শিরোনাম (Title of Research)

পূর্ব – রাঢ় বাংলার হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও কিংবদন্তি

(PURBO – RARH BANGLAR HINDU MANDIRER STHAPOTYO O KINGBADANTI)

RESEARCH SCHOLAR

BEBI PATRA (SAMANTA)

VILL + P.O – DEULPARA , P.S – PURSURA,

DIST - HOOGHLY , WESTBENGAL .

PIN – 712414

SUPERVISOR

D.R MANAS ACHARYYA

ASSISTANT PROFESSOR DEPT OF BENGALI , B.B.M.K.UNIVERSITY , DHANBAD

---- : TITLE :---

PURBO -RARH BANGLAR HINDU MANDIRER STHAPOTYO O KINGBADANTI

(পূর্ব – রাঢ় বাংলার হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও কিংবদন্তি)

----- : RESEARCH SCHOLAR : ---

BEBI PATRA (SAMANTA)

গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (SUMMARY OF THE RESEARCH WORK)

গবেষণার প্রকরণ ও পদ্ধতি (RESEARCH METHODOLOGY)

RESEARCH METHODOLOGY : ANALYTICAL RESEARCH TOOLS

1. **DATA COLLECTION AND ANALISIS**
2. **COLLECTION FROM LIBRARY**
3. **PURCHASE BOOK**
4. **INTERVIEW WITH FOLK PEOPLE AND FIELD WORK**

গবেষণার বিষয় (OBJECTIVE OF RESEARCH)

পূর্ব -রাঢ় বাংলার হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও কিংবদন্তি (PURBO – RARH BANGLAR HINDU MANDIRER STHAPOTYO O KINGBADANTI)

অনুমান (HYPOTHESIS) : লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস – সংস্কারের প্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক দিকের আলোকপাত।

তাৎপর্য (SIGNICANE) : অতি আধুনিক যন্ত্র নির্ভরতার যুগে মানব সভ্যতার শিকড়ের সন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকা : (INTRODUCTION) .

প্রথম অধ্যায় (FIRST CHAPTA) : পূর্ব – রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান (PURBO – RARH BANGLAR BHOUGOLIK ABOSTHAN).

দ্বিতীয় অধ্যায় : (SECOND CHAPTA) : হিন্দু ধর্মের বিবর্তনে পঞ্চ দেবতার উপাসনা (HINDU DHARMER BIBARTONE PANCHO DEBOTAR UPASONA).

তৃতীয় অধ্যায় : (THIRD CHAPTA) : স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় (STHAPOTYO SILPER PARICHOY)

চতুর্থ অধ্যায় : (FORTH CHAPTA) : কিংবদন্তির স্বরূপ (KINGBADANTIR SWARUP).

পঞ্চম অধ্যায় : (FIFTH CHAPTA) : জেলা ভিত্তিক কিংবদন্তিযুক্ত স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় (JELA BHITTIK KINGBADANTI JUKTO STHAPOTYO SHILPER PARICHOY)

ষষ্ঠ অধ্যায় : (SIXTH CHAPTA) পূর্ব – রাঢ় বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন (PURBO - RARH BANGLAR STHAPOTYO NIDORSON)

সপ্তম অধ্যায় : (SEVENTH CHAPTA) : স্থাপত্য ও কিংবন্তির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (STHAPOTYO O KINGBADANTIR BORTOMAN O BHABISHOT)

উপসংহার (CONCLUSION)

SIGNIFICANT OF THE SUBJECT

তথ্যসূত্র (REFERENCE)

গ্রন্থপঞ্জী (BIBLIOGRAPHY)

(ক) আকর গ্রন্থ (PRIMARY SOURCE)

(খ) সহায়ক গ্রন্থ (SECONDARY SOURCE)

(গ) পত্র – পত্রিকা (JOURNAL)

বিষয় : পূর্ব – রাঢ় বাংলার হিন্দু মন্দিরের স্থাপত্য ও কিংবদন্তি

(PURBO – RARH BANLAR HINDU MANDIRER STHAPOTYO O KINGBADANTI)

মুখবন্ধ (INSTRUCTION) : ভূমিকা

মূল্যবোধের অন্বেষণে সমাজের যে প্রচেষ্টা তার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সংস্কৃতি। যেকোনো সমাজের অন্তর্লোকের পরিচয় পেতে গেলে সেই প্রকাশের বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রত্যেক জাতির একটি করে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে ; সংস্কৃতি হল দেশ তথা জাতির প্রাণ। বাংলার সংস্কৃতিতে রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই অঞ্চলের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ,লোকসংস্কৃতি , জীবনচর্চা সবকিছুরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে , আর এ বৈশিষ্ট্যই বঙ্গ সংস্কৃতিকে বিশেষ রূপ দিয়েছে।

অতি আধুনিক যন্ত্র নির্ভরতার যুগে মানুষের মন থেকে আবেগপ্রবণ মন , কল্পনাপ্রবণ মন ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে কালের ধাক্কায়। শিশুমনের গহন অন্তর্লোকে ঢেউ তুলে যাওয়া সেইসব রূপকথার গল্প এখন আর শিশুমনের গভীরে রেখাপাত ফেলে না। মনের গভীরে ঢেউ না তুলে দমকা হাওয়ার মতো কেবলমাত্র মনের উপর দিয়েই চলে যায়। কালের ধাক্কায় হারিয়ে যাচ্ছে তেপান্তর মাঠ , পক্ষীরাজ ঘোড়া যেগুলি এক নিমিষে শিশুমনকে হারিয়ে নিয়ে যেত সাত সাগর আর তেরো নদীর পাড়ে এক স্বপ্ন ঘেরা রাজ্যে ।শৈশবাস্থায় ঠাকুমা ,দিদিমার মুখে শোনা রূপকথার গল্পগুলি শিশুমনে এক আবেশের সৃষ্টি করত। কল্পনাপ্রবণ মন এক নিমিষেই হারিয়ে যেত কল্পরাজ্যের সীমানায় , চোখের সামনে সব ছবির মতো ভেসে উঠত সেইসব রূপকথার জগতের ছবি।

শান্ত – স্নিগ্ধ প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা গ্রাম -বাংলার এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে কোনো মন্দির নেই। কালের করাল গ্রাসকে উপেক্ষা করতে না পেরে বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ শুধু কতগুলি ভাঙা ইঁটের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে অতীতের নীরব ইতিহাস বহন করে আছে। এরকম মন্দির দেখে মন কেঁদে ওঠে , এই মন্দিরেই একদিন দেবারতি হত , ভক্তদের পায়ের ধূলায় ভরে যেত মন্দির প্রাঙ্গণ। কিন্তু বর্তমানে জঙ্গল আর সাপের আস্তানা হয়ে উঠেছে সেই স্থান। আমার মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে মন্দির সম্পর্কে হারিয়ে যাওয়া তথ্য জানার জন্য।

মন্দিরের ঘন্টার অনুরণের সঙ্গে সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আমাদের বিশ্বাস – সংস্কারের ভীত। বিশ্বাসের ডানায় ভর করে গড়ে ওঠে সুসংহত সমাজের কৃষ্টি ,সংস্কৃতি , নৃতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক দিক লোকাচারকে আরো দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে মাটির পৃথিবীর সঙ্গে। জীবন আর কৃষ্টি ওতোপ্রতোভাবে এক হয়ে তাদের মনে এক আবেশের সৃষ্টি করে। ; যান্ত্রিকতার ধাক্কায় লোকসমাজের ভীত ক্রমশঃ আলগা হয়ে জীবনের সহজ ,সরল দিকগুলি হারিয়ে যেতে শুরু করেছে ,,, তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত আহ্বান করেছিলেন “ **ফিরে চল মাটির টানে**

।" এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকেই মাটির পৃথিবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমিও নতুন করে খুঁজে পাওয়ার তাগিদে বেরিয়ে পড়তে চাই লোকায়ত সমাজের অন্তরীক্ষে। এই কৌতূহলকে কাজে লাগিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই গ্রামে – গ্রামে স্থাপত্য ও কিংবদন্তি সংগ্র করার জন্যে। লৌকিক ,প্রথা ,রীতি -নীতি , আচার- আচরণ , থেকে যতটুকু পুরাকালের সংস্কৃতি উদ্ধার করা যায় তাতেই মনোনিবেশ করা আমি যুক্তিসংগত মনে করি। এর প্রত্যক্ষ কারণ গ্রাম বাংলার হাতছানি সেইসঙ্গে প্রত্যন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সৌভাগ্য , আর আমি সেই সৌভাগ্যকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করব।

বর্তমানে যন্ত্র দানবের যুগে তথ্যের বিপ্লব ঘটে গেছে। লোকসংস্কৃতির তলিয়ে যাওয়ার উপকরণ খোঁজার তাগিদে বেরিয়ে পড়তে চাই গ্রাম – গ্রামান্তরে। জন্ম সূত্রে বাঁধা আছি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ; এদের বিশ্বাস – সংস্কারের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছি বাল্যকাল থেকেই। বাল্যকালে ছিল কৌতূহল ,আর সেই কৌতূহলকে কাজে লাগিয়ে খোঁজার চেষ্টা করব লোকসমাজের ভিত্তি।

পুরনো স্থাপত্য রীতিকে কালের করাল গ্রাস থেকে আমি হয়তো রক্ষা করতে পারব না ঠিকই , কিন্তু সেই পুরনো দিনের কীর্তিকে বিষয়ের মধ্যে কিছু হলেও বাঁচিয়ে রাখতে পারব। কিংবদন্তির কাহিনি গড়ে ওঠে লোকসমাজের ডানায় ভর করে। বর্তমানে যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে পারে না , কোথায় যেন একটা অবিশ্বাস থেকেই যায়। একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে **'যা রটে তা কিছুটা বটে ' ,,,** তাই যদি হয় তাহলে কিংবদন্তির মধ্যেও কিছে সত্যের যোগসূত্র রয়েছে , সেই সত্য অনুসন্ধানের তাগিদেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই লোকসমাজের যোগসূত্র খোঁজার জন্য। গবেষণার নিগূঢ় অনুসন্ধানের ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হোক হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতির অন্তরালে লোকসমাজের।জীবন প্রবাহ।

মূল বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য আমি নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

প্রথম অধ্যায় : পূর্ব – রাঢ় বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান

(PURBO – RARH BANGLAR BHOUGOLIK ABISTHAN)

এই অধ্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানগত নিরীখে পূর্ব- রাঢ় বাংলার অন্তর্গত জেলাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকবে। জেলাগুলির উৎপত্তির ইতিহাস , জেলাগুলির নামকরণের দিকও তুলোধরা হবে এই অধ্যায়ে ; সেইসঙ্গে এই সব জেলার লোকসংস্কৃতি দিকের প্রতিও আলোকপাত করা হবে। ভৌগোলিক , রাজনৈতিক ,জনবসতির চাপে এই সীমা বিভাজিকা প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে আগে রাঢ় বলতে যা বোঝাতো পরবর্তীকালে প্রয়োজনের তাগিদে তা বহুলাংশে সংকুচিত হয়েছে। এখন রাঢ় বলতে সমগ্র বীরভূম ,সমগ্র পুরুলিয়া , সমগ্র বাঁকুড়া , মেদিনীপুর ,হুগলি ও হাওড়াকে বোঝায়। আমার গবেষণার বিষয় **‘পূর্ব – রাঢ় বাংলার স্থাপত্য ও কিংবদন্তি ’** তাই এই অধ্যায়ে হুগলি , হাওড়া ,পূর্ব মেদিনীপুর , পূর্ব বর্ধমান ,পূর্ব বাকুড়া ও বীরভূম জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকবে।

(ক) হুগলি জেলার পরিচয় (HUGHLI GELAR PARICHOY)

হুগলি জেলা ভাগীরথী বা হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। মানচিত্রে এই জেলাকে প্রজাতির মতো দেখায় , যার পশ্চিম মুখী ছোটো পাখাটি মেদিনীপুর সংলগ্ন এবং পূর্ব মুখী বড়ো পাখাটি ভাগীরথীকে স্পর্শ করেছে। দুটি পাখার মধ্যবর্তী দামোদর নদ সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। দামোদর ও ভাগীরথী নদী দুটি বরাবরই হুগলি জেলার ভাগ্যনিয়ন্তা করেছে। যার প্রভাব হুগলি জেলার জনজীবন ও বসতি বিন্যাসের ওপর প্রচণ্ডভাবে লক্ষ্য করা যায়।

হুগলি জেলার নামকরণ এই জেলার অন্যতম প্রধান শহর ‘হুগলি’র নামানুসারে হয়েছে। ষোড়শাশতকে পর্তুগিজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম থেকে সরে এসে এই অঞ্চলে তাদের পণ্য মজুত করে রাখার জন্য গুদাম বা গোলাবাড়ি তৈরি করেছিল ,আর সেই ‘গোলা’ থেকেই ‘হুগলি’ নামকরণ হয়েছে। হুগলি নামকরণ প্রসঙ্গে বসন্ত কুমার সামন্ত মন্তব্য করেছেন -

“ একটা প্রশ্ন এসে যায় , ভাগীরথীর তীরে এই জলপথের নাম ‘হুগলি ’ নাম কীভাবে কখন থেকে হয়েছিল !পোর্তুগীজ ঐতিহাসিক বলেন ,ঐ জনপদের পাশে প্রচুর হোগলা গাছ জন্মাত। সেই হোগলা থেকেই ‘ হুগলি’ নামটি এসেছে।“ (১)

আবার অন্য আরেক জায়গায় বসন্ত কুমার সামন্ত এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন –

“ আবুল ফজলের ‘আইনি আকবরী ‘গ্রন্থে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) ও আবদুল হামির লাহেরীর লেখা (১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে) ইত্যাদিতে স্পষ্টভাবে ‘হুগলির’নামটি ব্যবহৃত হয়েছে ,,,,,,,,, বিদেশীদের রচনায় উচ্চারণ বিকৃতি থাকলেও মুসলমান লেখকগণ সঠিক উচ্চারণেই জধপথের নাম লিখেছেন সেইদিক থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় ‘হুগলি’ নামটি বিদেশীদের দেওয়া নয়।“ (২)

হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু লৌকিক দেব -দেবীর মন্দির গড়ে উঠেছে। তবে হুগলি জেলার পরিচয় সবকিছুকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তারকেশ্বরের তারকনাথের মন্দিরের হাত ধরে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাতারে কাতারে ভক্তের সমাবেশ ঘটে যা আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগেও এসে আমাদের বিস্মিত করে। আমাদের যুক্তি ,চিন্তা সব যেন একাকার হয়ে গিয়ে একজায়গায় আটকে গেছে তা হল বিশ্বাসের খুঁটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে দ্রুত পরিণত করে দেয়। এরপর অবক্ষয়ী সাংস্কৃতিক আগ্রাসী আক্রমণ এবং এর বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সাহিত্য শিল্পের সংগ্রাম হুগলি জেলার সাংস্কৃতিক পালাবদলের ইতিহাস সূচিত হল।তবে নাগরিক ও গ্রামীণ শিল্প সংস্কৃতির সম্মিলিত অভিযানই আগামী দিনের সুস্থ সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হবে - একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

(১) বসন্তকুমার সামন্ত , 'হুগলি জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (হুগলি জন্মকথা) ,সাহিত্য সেতু প্রটাশনী , প্রথম প্রকাশ (১৪০৯) পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১২।

(২) ঐ : পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৫।

(খ) হাওড়া জেলার পরিচয় (HAORHA JELAR PARICHOY)

হুগলি নদী এই জেলার পূর্ব সীমানায় বরাবর প্রবাহিত এবং রূপনারায়ণ নদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে হাওড়া জেলার প্রাকৃতিক সীমানা নির্দেশ করেছে। ১৯৩৭ সালে হাওড়া জেলা একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

'হাওড়া' নামটির উৎপত্তি বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। একটি মতে হাওড়া শহরের অদূরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ' **হাড়িড়া** ' নামে একটি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল , ' **হাওড়া'** নামটি এই ' **হাড়িড়া** ' নামেরই অপভ্রংশ। আবার অন্যমতে ' **হাবড়** ' শব্দটি থেকে এসেছে যার অর্থ যেখানে পাঁক ও কাদা বেশি। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনের মতে ' **হাওড়া'** শব্দটি এঅটি ধন্যাত্মক শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে এর অর্থ যেখানে জল কাদা। ' **গেজেটিয়া** ' গ্রন্থে এস চক্রবর্তী হাওড়া নামের উৎপত্তির পিছনে বলেছেন **'হাওড়া'** নামটির উৎপত্তি সম্ভবত **'হাবোড়' শব্দ থেকে** যর অর্থ নীচু জলা ভূমি।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হচ্ছে **'ড়া'** অনুসর্গ যুক্ত স্থান।নাম কিংবা দেশনামের উৎপত্তি ঘটেছে -অস্ট্রিক শব্দ **'ওড়ক'** থেকে যার অর্থ বাসগৃহ। হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর লৌকিক দেব -দেবীর মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। আর সারা বছর বিভিন্ন সময়ে নানা লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এই জেলায়।

(গ) মেদিনীপুর জেলার পরিচয় (MEDINIPUR JELAR PORICHOY)

মেদিনীপুর নামটির উৎপত্তি বিষয়ে বেশকিছু জনশ্রুতি জনমানসে প্রচলিত আছে।১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডিচা দেশের (বর্তমানে ওড়িশা) সামন্ত প্রাণকরের পুত্র মেদিনী কর এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই মেদিনী করের নামানুসারে মেদিনীপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। অন্য একটি মতানুসারে বলা হয়েছে সুদূর মদিনা থেকে মাদিনী শাহ এক পীর এই অঞ্চলে এসেছিলেন **'মাদানী শাহ'** ক্রমে মেদিনীপুর হয়েছে এ সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আরেকটি জনশ্রুতি অনুসারে বলা হয় 'মেদিনী মাতার' মন্দির থেকেও মেদিনীপুর নামটি এসেথে।কেউ কেউ বলেন এখানে **'মেদ'** নামে এক আদিম উপজাতির বাস ছিল ;মেদ শব্দের অর্থ হাতি মেদা থেকেও এই জেলার নামকরণ হতে পারে।

মেদিনীপুর জেলায় অনেক লৌকিক দেব -দেবীর পীঠস্থান। এখানেও সারা বছর নান লৌকিক উৎসব পালিত হয়।এই পরিচ্ছেদে এই সব দিকের প্রতি আলোকপাত করা হবে।

(ঘ) পূর্ব বর্ধমান জেলার পরিচয় (PURBO BARDHAMAN JELAR PARICHOY)

২০১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭এপ্রিল প্রাক্তন বর্ধমান জেলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব বর্ধমান দেলা ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা গঠিত হয় । বর্ধমান ধামটির উৎপত্তির পিছনে নানা মত প্রচলিত আছে ।একটি মতানুসারে জৈন আরঙ্গ সূত্রে উল্লেখিত সুক্ষ্ম ভূমিই হল আজকের বর্ধমান । আবার অনেকেই মনে করেন বর্ধমান নামের সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের নাম জড়িত আছে ।পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের মতে উজুবালিয়া নদীর তীরে মহাবীর নির্মাণ লাভ করেছিলেন ।খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অস্ট্রিক বীর যাযাবর ,ডোম , বোড়ো ইত্যাদি উপজাতি বাস করত বর্ধমানে ।

বর্ধমানে বিখ্যাত ১০৮ শিবমন্দির ,সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির এখানকার জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে । লৌকিক বিশ্বাস – সংস্কার ,কিবদন্তি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এখানকার মানুষের মনে ।এই পরিচ্ছেদে এখানকার মানুষের বিশ্বাস -সংস্কার সব কিছুই তুলে ধরা হবে ।

(ঙ) বীরভূম জেলার পরিচয় (BIRBHUM JELAR PARICHOY)

বীরভূম জেলার নামটির উৎপত্তি বিষয়ে বেশ কিছু জনশ্রুতি জনমানসে প্রচলিত আছে । বীর যোদ্ধা দেশ হিসাবে প্রাচীন কালে বীরভূমের বেশ নাম ছিল । অন্য একটি মতানুসারে মানভূম , মল্লভূম , বল্লভূম , সিংভূম মল্লদের বিভিন্ন সম্প্রদায় কালে কালে মল্লভূমি থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে যার নামানুসারে মালভূম , সিনভূম প্রভৃতি বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন আর এইভাবেই বীরভূম নামটি এসেছে । কথিত আছে ১৩৫০খ্রীষ্টাব্দের আগে এবং পরে সুবর্ণাগ্রাম ও লক্ষ্ণণাবতীর শাপনকর্তা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে ছিলেন ;এই রাজনৈতিক সুযোগে বীর উপাধি ধারী এক হিন্দু বীরভূমের পুরনো রাজধানী লক্ষুরে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন । আর এই বীর রাজার নামানুসারে বীরভূম ধামের সৃষ্টি হয়েছে ; আবার অন্য একটি মতানুসারে বলা হয়েছে বীর সিংহ বীরসিংহপুরে নিজের নামে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ।এই বীর সিংহই বীরভূমের আদি হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা , আর এই বীর সিংহ রাজার নাম থেকেই এই দেলার নাম হয়েছে বীরভূম ।

বীরভূম বাউলদের।দর্শন ও সংগীত এই জেলার লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । এছাড়াও বীরভূমের অনেক কবিয়াল ,কীর্তনীয়া ও অন্যান্য লোকসংস্কৃতির গোষ্ঠীর বাস । বীরভূমে অসংখ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয় ।এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা , জয়দেবের কেন্দুলির মেলা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় ।যাত্রা কবিগান ,আলকাপের মতো লোক বিনোদনের অনুষ্ঠান অনেকের পৃষ্ঠপোষকতায় অয়োজিত হয় । এই জেলার বিখ্যাত মন্দির তারাপীঠের মন্দির যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু কিংবদন্তি । এই পরিচ্ছেদে বীরভূম জেলাকে কেন্দ্র করে লোকসমাজের নানা দিকের প্রতি আলোকপাত করা হবে ।

(চ) বাঁকুড়া জেলার পরিচয় (BANKURA JELAR PARICHOY)

দামোদর নদ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা দুটিকে পৃথক করেছে । ১৮৮১ সালে আধুনিক বাঁকুড়া জেলার প্রতিষ্ঠা হয় । জেলার নামকরণ করা হয়েছে জেলা সদর শহরের নামানুসারে । বাঁকুড়া শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ আছে । কোল ,মুণ্ডাদের ভাষায় **‘ওড়া’** বা **‘রা’** শব্দের অর্থ বসতি । **‘বাঁকু’** শব্দের অর্থ এবড়োখেবড়ো । বাঁকুড়া নামটি বাঁকা শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী লৌকিক দেবতাদের মধ্যে একজন।হলেন ধর্মঠাকুর ,তাঁকে স্থানীয়রা বাঁকুড়া রায় নামে ডাকে স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে জেলা সদর বাঁকুড়া শহরের নামানুসারে হয়েছে । আবার অনেকেই বলেন এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় গোষ্ঠীপতি নেতা বাঁকু রা এর নামানুসারে হয়েছে ।

এখানকার শ্যামরায়ের মন্দির বিখ্যাত। বাঁকুড়া জেলা টেরাকোটা শিল্প শৈলীর শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। অতুলনীয় কারুকার্য খচিত এখানকার মন্দে শিল্পশৈলীর অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করব এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : হিন্দু ধর্মের বিবর্তনে পঞ্চ দেবতার উপাসনা (HINDU DHARMER BIBRTONE PANCHO DEBOTER UPASONA)

উর্বর ভূমির মতোই রাঢ় বাংলার মানুষের ধর্মীয় চেতনার বহু দেবতা বিরাজ করছেন । সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা । শিবের জটিল জটাজালে অনেকগুলি ধারা আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বহু লৌকিক দেবতা । এই অধ্যায়ে আমি বিভিন্ন লৌকিক দেব -দেবীর কিছুটা দেবার চেই করব । পূর্ব -রাঢ় বাংলার পরিত্যক্ত , ব্যবহৃত শিব মন্দিরের সংখ্যা অনেক আছে । আর আছেন গাঁয়ের কৃষক দেবতা বৈভবহীন বুড়ো শিব । শিবকে অবলম্বন করে **'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি'** অর্থাৎ পূজার চেয়ে প্রাধান্য পায় উৎসব । গাজন ,মেলা ,সঙ , চড়কের মেলা ,লীলাবতীর বিয়ে ,শিবরাত্রির অন্তর আলোড়িত করা কল্লোল দিয়ে শিব খুবিই লোকরঞ্জক দেবতা । অনেক জায়গাতেই শিব নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে যুক্ত ; শিবের মূল সন্ন্যাসীরা বহুক্ষেত্রে।নিম্নবর্গের মানুষ গোপ ,দুলে ,ডোম সম্প্রদায়ের তারা পুরোহিতের মতোই মর্যাদা পান অনুষ্ঠানের সময়।

পূর্ব -রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ দেবতা ধর্ম ঠাকুর প্রধানত নিম্নবর্গীয়দের অধিকার ।কেউ কেউ বলেন ইনি আদিতে ছিলেন আরণ্যক দেবতা । এঁদের পূজারীও ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ । বর্তমানে ধর্ম ঠাকুর আর শিব ঠাকুর ভক্তির আশ্রয়ের তলায় এসে এক হয়ে গেছেন ।

পঞ্চাননও গ্রাম্য দেবতা । ইনি শিশু রোগের দেবতা ; কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে ইনিও শিবের জটাজালে আটকে গিয়ে এক হয়ে গেছেন । শিবই তো বর্তমানে পঞ্চানন দেবতা রূপে পূজিত হন ।পূর্ব – রাঢ় বাংলায় বিভিন্ন ধর্ম পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্কের দ্বারাই পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল ;কিন্তু তার শক্তিশালী অনুঘটক ছিল লৌকিক দেবভাবনা । ত্রিবেণী ছিল হিন্দু , বৌদ্ধ , জৈন এই ধর্মাবলম্বীদের মিলিত তীর্থক্ষেত্র ।

নগরকেন্দ্রিক দেবালয়গুলি ছিল রাজাদের কিংবা বিত্তবানদের পারিবারিক কীর্তি । এই মন্দিরগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হত সাধারণ মানুষ । জনসংযোগের তাগিদেই এই সব পূজা পদ্ধতিতে মেলা ,জাত যাত্রা লোক আঙ্গিককে গ্রহণ করা হয় প্রতাপশালী দেবতাদের নামতে হয় লোকসংস্কারের মাটিতে । এই দেবতাদের স্থাপত্য কীর্তি সমৃদ্ধ মন্দিরগুলি কালের অমোঘ নিয়মে ধ্বংস হয়ে গেছে । কিন্তু বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ দেবতারা জনগণের অমরত্ব থেকে আয়ু সংগ্রহ করে আজও বেঁচে আছেন । ভাঙার মতো মন্দির এদের ছিল না – শীত ,গ্রীষ্ম ,বর্ষায় গাছতলা বা মাটির চালাঘর অবলম্বন করেই এরা কালের কপোলতলে ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল ।

তৃতীয় অধ্যায় : স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় (STHAPOTYO SILPER PARICHOY)

বিভিন্ন প্রকরণ স্থাপত্য কীর্তি তুলে ধরা হবে এই অধ্যায়ে । বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র অথবা উঁচি নিচু অনুর্বার প্রান্তরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বনভূমি আর প্রবাহমান নদীনালার জলধারায় সঞ্জীএ ভূ-ভাগের স্থানে আজও চোখে পড়ে নানান ধর্মীয় ইমারৎ । মন্দিরের গঠনগত দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় । এই অধ্যায়ের মন্দিরের গঠনগত দিক থেকে বিচার করে মন্দিরের বিভিন্ন প্রকরণগত আলোচনা থাকবে ।

নদ-নদী বহুল নরম পলিমাটি বাংলার শিল্পকলার অন্যতম উপকরণ হিসাবে সুদূর অতীত কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে পাথর দুর্লভ বলে এখানকার স্থাপত্য কীর্তি সমস্তই ইঁটের দ্বারা নির্মিত। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে এই সব শিল্প কীর্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতো হিন্দু যুগে এখানে যে মন্দিই নির্মিত হয়েছিল , তার প্রমাণ থাকলেও প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েই মিলে সেই সব দুর্লভ নিদর্শন লোপ করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরা বলেছেন –

" প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরধর্ম বিদ্বেষীদের আক্রমণের কারণে এই সব প্রাচীন স্থাপত্য সৌধ্যের অধিকাংশই আজ বিলুপ্ত ও বিনষ্ট। সেদিক থেকে যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বাংলার প্রতিষ্ঠিত মন্দির স্থাপত্য কখন কীভাবে শুরু হয়েছিল তা নির্ণয় করা বেশ কষ্টসাধ্য।" (১)

বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস তাই অনুমান সাপেক্ষ।নবপর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের গঠন রীতি অনুসারে মন্দিরগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(১) রেখ বা শিখর (REKHO BA SHIKHAR)

(২) ভদ্র বা পীঢ়া (BHADRO BA PIRHA)

(৩) চালা (CHALA)

(৪) রত্ন (RATNO)

(৫) দালান।(DALAN)

((১) রেখ বা শিখর রীতি (REKHO BA SHIKHAR RITI) :- বাংলার সঙ্গে ওড়িশার দীর্ঘকালীন যোগাযোগের সূত্রে বাংলায় একদা নির্মিত হয়েছিল ভারতীয় স্থাপত্যের সনাতন নগর রীতির অনুসারে ওড়িশা প্রভাবিত শিখর মন্দির এবং গর্ভগৃহ শিখা রীতির সঙ্গে **'জগমোহন'** নামে সৌধটি যুক্ত হত তাকে **'পীঢ়া'** বলা হয়। রেখদেই চাল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে ক্রমশঃ ছোটো হয়ে উঠে যায় এবং সর্বোচ্চ স্তরে থাকে চূড়া। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈচী গ্রামের মন্দির , বাঁকুড়া জেলার মাসড়া গ্রামের মন্দির। ,বর্ধমানের কুলীন গ্রামের গোপালের মন্দির রেখ দেউলের মন্দিরের উল্লেখযোগ্য নিদরি।

(২) পীঢ়া রীতি (PIRHA RITI) : পীঢ়া রীতি মন্দিরের বিকাশ ওড়িশায় বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত মন্দিরটির আচ্ছাদন ছাদ প্রস্তুত করা হত দৃঢ়বদ্ধ এক পিরামিড আকৃতি বহিঃরেখার ভিতর এবং এই বহিঃরেখা সৃষ্টির জন্য দেওয়ালের ওপর থি কতকগুলি চাল ওপরের দিকে সিঁড়ির মতো ধাপ কাটা অবস্থায় ক্রমশঃ ছোটো হতে থাকে।বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানে এ ধরণের শিল্প স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। মেদিনীপুরের কেশপুরের কামেশ্বরের মন্দিরের গঠন রীতি পীঢ়া রীতি।

(৩) চালা রীতি (CHALA RITI) : বাংলার গ্রামাঞ্চলে কাঠ ,বাঁশ ,খড়ের চালা দেওয়া মেটে ঘর বা পাতার ঘর বহু প্রাচীন কাল থেকেই সাধারণ মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণ মাটির চারচালা বা আটচালা ঘরের সামনে দাওয়াকে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই চালার প্রয়োজন হত। একচালার দু'পাশে ফাঁকা অংশ ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজনেবাড়তি চাল সংযোগ করায় সেটি হয়ে যায় তিনচালা। এ প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচারের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

" একে কেউ কেউ লোকায়ত বা লোকস্থাপত্য বা ফোক আর্কিটেকচার বলে উল্লেখ করেন।"(২)

(৪) রত্ন রীতি (RATNO RITI) : রত্ন মন্দির বাঙালি স্থপতির এক নবতম আবিষ্কার। পুরাতন ও নতুনের সংমিশ্রণে রত্ন মন্দিরের আবির্ভাব। বিভিন্ন রীতিগত মন্দিরের মিলন ও মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত এক সৃজনধর্মী স্থাপত্য গঠনে বাংলার কারিগরেরা তাঁদের মুন্সিয়ানার পরিএ রেখেছেন। রত্ন কথার অর্থ হল চূড়া। রত্ন মন্দির

একরত্ন ,পঞ্চরত্ন , নবরত্ন ,ত্রয়োদশরত্ন বিশিষ্ট হয় । মন্দিরের চূড়ার সংখ্যা অনুযায়ী এগুলোর নাম নির্ধারণ করা হয় । একরত্ন মন্দিরের নিদর্শন খানাকুলের রাধাবল্লভ মন্দির , পঞ্চরত্ন মন্দির দেখতে পাওয়া যায় হুগলি জেলার দশঘরার রাধাগোবিন্দের মন্দির । নবরত্ন মন্দিরের নিদর্শন আছে হুগলি জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার বাকসার রঘুনাথের মন্দির ।

(৫) দালান ((DALAN) : অনেক ক্ষেত্রে মূল মন্দিরের সামনে দালান বা নাট মন্দির থাকে ।মন্দির ছাড়াও প্রচুর রাসমঞ্চ ,দোলমঞ্চ দেখতে পাওয়া যায় । এগুলো মূলতঃ খিলান ,স্তম্ভ ও শিখর দিয়ে তৈরি হয় । সাধারণত রাসমঞ্চ আটকোনা ভিত্তির উপর নির্মিত হয় ।

সাধারণ ইঁটের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ বছর , তারপরেই নোনা লেগে ইঁট ক্ষয় হয়ে যায় । কিন্তু পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য যে মাটি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে শিল্পী এমন কিছু গোপনীয় জিনিস মেশান যাতে ফলকগুলি পাঁচশ বছর রোদ , বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অক্ষত হয়ে শিল্প শৈলীর নিদর্শন হয়ে বেঁচে আছে ।

তথ্যসূত্র :

(১) তারাপদ সাঁতরা , পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ' , পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী (১৯৯৮) , পৃষ্ঠা সংখ্যা :১

(২) ব্রাউন , 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ', প্রথম সংস্করণ (১৯৮২) পৃষ্ঠা :১৫৬

চতুর্থ অধ্যায় : কিংবদন্তির স্বরূপ (KINGBADANTIR SWARUP)

এই অধ্যায়ে কিংবদন্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে । আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে উঠে আসা তথ্যের নিরীখে আলোচনা থাকবে এই অধ্যায়ে । কিংবদন্তি নানা রঙের ডালি সাজিয়ে লোকসমাজের মানুষের ডানায় ভর করে গড়ে ওঠা এক ধরণের অতি লৌকিক আর বাস্তবতার সংমিশ্রণে গড়ে উঠা কাহিনি -এই অধ্যায়ে লোক সমাজের মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরা হবে ।

কিংবদন্তি গড়ে ওঠে কোনো একটা অসাধারণ বিষয় নিয়ে । কোনো ঘটনা , কোনো স্থান, কোনো বস্তু কিংবা কোনো মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কিংবদন্তি । উৎসের মূলে কোনো না কোনো বাস্তব ঘটনা থাকেই যেটার সম্পর্কে আপাত বুদ্ধিতে কোনোরকম বিশ্লেষণ করা যায় না । আর তাই ওই অবিশ্লেষিত ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান, বস্তু মানুষের প্রসঙ্গে কালক্রমে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে । কিংবদন্তিগুলি হল অর্ধেক কল্পনা আর অবৈধ ইতিহাস । কিংবদন্তির অন্তরালে একটা বাস্তব কাঠামো লুকিয়ে থাকে । যুক্তি ,তর্ক ,বিশ্লেষণ তখন হয়ে পড়ে বৃথা ,সংস্কার ,বিশ্বাস ,অন্ধ প্রত্যয়ই তখন হয় মুখ্য । এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন :

" কিংবদন্তি গড়ে তোলার পিছনে এমন একটি মানসিকতা সক্রিয় থাকে , যার শিকড় স্মরণাতীত প্রাগিতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন সময় কাল থেকে মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে সহস্র প্রজন্ম পরম্পরায় ।"(১)

কিংবদন্তিগুলি হল বাস্তব ও কল্পিত ঘটনার খণ্ড খণ্ড অবয়ব , অবিন্যস্ত ,সৌষ্ঠব বিহীন কথাশিল্পের কাঁচামাল । কিংবদন্তির সৃষ্টির বিরাম নেই , ঘটনা অতীত হয়ে যায় ,ইতিহাস তার দাগ রেখে দিয়ে যায় তার ভগ্ন দুর্গপ্রাকারের এক একটি ইঁটের খণ্ডে ,প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে । কোথাও বা সে চিহ্ন থাকে না ; কিন্তু ইতিহাসের সেইসব ঘটনার একটি অশরীরী রূপ জীবন্ত করে রাখে কিংবদন্তি । প্রত্যেক দেশেরই জনসমাজে শত সহস্র কিংবদন্তি প্রচলিত আছে । কিংবদন্তি জাতির বিশেষ এক শ্রেণির কথা সাহিত্য ।সুবোধ ঘোষ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন –

“ অরণ্যের নিভৃত সমাশ্রিত পুষ্পকুঞ্জের মতোই কিবদন্তিগুলোর রূপ যেন প্রাণের সহজ আবেগে নিজেকে প্রকাশ করেছে । বাগানের পুষ্পকুঞ্জের অনুরূপ কোনো পারিপাট্য এদের।নেই ,টারণ এরা কোনো দক্ষ মালির হাতে সেবায় ও যত্নে লালিই নয় , কিন্তু বর্ণ ও সৌরভের কোনো অভাব নেই ।“ (২)

মানুষের মন স্ববভাবতই সৃজনধর্মী । তাই চিত্তাকর্ষক যা কিছু সে শোনে তারই উপর ভিত্তি করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সে সৃষ্টি করে কাহিনি । তার মূল অন্বেষণ করলে অতিরঞ্জনের দেখা হয়ত মিলতে পারে ,কিন্তু অসত্যের দেখা মিলবে না । আবার শুধু কাহিনি সৃজন করলেই যথেষ্ট নয় , লোকপরম্পরায় সেই আদি কালের কাহিনিই উত্তরকালের জনশ্রুতি রূপে ,রসে মণ্ডিত হয়ে জন্ম নেয় কিংবদন্তি । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মন কিছু রাখে আর কিছু ছাড়ে ,কিছু বা নতুন রঙের প্রলেপ চড়ায় পুরনো কাঠামোর ওপর । তাই সর্বদেশের সর্বকালের প্রচলিত কিংবদন্তি আসলে কোনো না কোনো অঞ্চলের কথাসাহিত্য । সেই অঞ্চলের রূপ ,রস ,শব্দ , গন্ধে কিংবদন্তির লালন ও সমৃদ্ধি ।

কিবদন্তি মানে যেমন সন তারিখ সীমায়িত ইতিহাস নয় ,তেমনি আকাশকুসুম কল্পনাও নয় , বহুক্ষেত্রে তাই নতুন ইতিহাস খুঁজে পেতে সাহায্য করে কিংবদন্তি নতুন করে লেখা হয় ইতিহাসের কোনো অজানা অধ্যায় ।

কিংবন্তিকে দু’ভাগে ভাগ করা যায় (ক) ধর্মীয় কিংবদন্তি, **(১) র্মনিরপেক্ষ । অথবা প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে দু’ভাগে ভাগ করা যায় (১) আঞ্চলিক ও (২) বৃহত্তর সামাজিক বলয় কেন্দ্রিক ।**

সাধুসন্ত কিংবা ধর্মীয় কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তি গড়ে ওঠে তাদের বলা হয় ধর্মীয় কিংবদন্তি । যেমন যীশু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যা ধর্মীয় কিংবদন্তি হিসাবে পরিগণিত হবে । পক্ষান্তরে ধর্ম নিরপেক্ষ কিংবদন্তির ক্ষেত্রে ওই ধরণের কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি থাকেন না । আঞ্চলিক কিংবদন্তি একটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ।‘বাবা ভূতনাথের কাছারির ‘প্রাঙ্গনে একটি গাছে ঢেলা বেঁধে পরপর তিন দিন ছুঁয়ে এলে নারীর কোলে সন্তান আসে -এই কিংবদন্তিটি হল একটি আঞ্চলিক কিংবদন্তি । আবার এমন কিছু কিংবদন্তি আছে যা আঞ্চলিক গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জনমানসে ছড়িয়ে পড়ে সেরকম কিংবদন্তি হল বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয় কিংবদন্তি । যেমন ফলের ঝুড়িতে করে শিবাজীর পলায়ন যা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে পড়েছে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে ।

জনমানসে মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি মাত্রেই কিংবদন্তি বলা যায় না । ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক কোনো বাস্তব নিদর্শন কে আশ্রয় করে যে কাহিনি জনমনের কোনো কল্পনার রূপ গ্রহণ করে ,সেই কাহিনিকেই যথার্থ কিংবদন্তি বলা যায় । এ প্রসঙ্গে পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্যটি পরিধানযোগ্য -

“ লিজেন্ট তাকে নিয়েই হয় , যার মধ্যে অতিমানব সুলভ কিছু কিছু সামর্থ্য আছে বলে অন্যেরা মনে করে । এই অতি দানবীয় কল্পনাই তাকে সাধারণ থেকে অনেক উপরে তুলে দেয় ।“(৩)

মানুষের মন একটা ব্যাখ্যা খুঁজবেই । সে ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছে অজ্ঞ গ্রামবাসীর অন্তরেস্থিত সেই চিরকালের কল্পনাপ্রবণ সত্তাটি ।

তথ্যসূত্র

(১) পল্লব সেনগুপ্ত , ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ‘ , এশিয়াটিক সোসাইটি , (১৪০৯) ,পৃষ্ঠা : ১৪৭ ।

(২) সুবোধ ঘোষ , ‘কিংবদন্তির দেশে’ , ‘ নিউ এজ পাবলিশার্স (২০০১) , ভূমিকাং ।

(৩) পল্লব সেনগুপ্ত ‘ লোককথার অন্তর্লোক ‘ , লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ , (২০০০), পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৭ ।

পঞ্চম অধ্যায় : জেলা ভিত্তিক কিংবদন্তি যুক্ত স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় (JELABHITIK KINGBADANTI JUKTO STHAPOTYO SHILPER PARICHOY)

এই অধ্যায়ে থাকবে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে উঠে আসা তথ্যের নিরীখে কিংবদন্তি যুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরের পরিচয় থাকবে। আদ্র গ্রাম বাংলার মানুষের মনও ছিল নরম প্রকৃতির , তাদের হৃদয়ে লালিত , পালিত হয়ে কালের প্রবাহমানতার।ধারায় অন্তরের অন্তঃস্থলে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়ে থাকে লৌকিক দেব দেবী কেন্দ্রিক কিংবদন্তি যার সাক্ষী বহন করে থাকে করে থাকে বিভিন্ন মন্দির উৎপত্তির নেপথ্য কাহিনি। এই অধ্যায়ে মন্দির গড়ে ওঠার পিছনে যে কিংবদন্তি লুকিয়ে আছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করব স্বল্প পরিসরে। কোনো কোনো মন্দির স্থাপত্য শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে কোনো না কোনো কিংবদন্তি লুকিয়ে থাকে ; মানুষের অবচেতন মনে তা বিরাজ করে গড়ে ওঠে বিভিন্ন লৌকিক দেব দেবীর পীঠস্থান। এই রকমই কয়েকটি মন্দির সৃষ্টির নেপথ্যে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তার কিছু দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ে থাকবে।

তারকেশ্বরের তারকনাথের মন্দির (TARAKESWARER TARAKNATHER MANDIR)

তারকনাথ শিব সয়ম্ভূ , ভারতবর্ষ জুড়েই আছে তার খ্যাতি। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ও মনস্কামনা সিদ্ধি লাভের জন্য অগণিত ভক্ত আজও এখানে প্রার্থনা জানাতে আসেন। মন্দিরটি ধির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন জমিদার ভারমল্ল। মন্দির উৎপত্তির পিছনে যে কিংবদন্তিটি লুকিয়ে আছে তা আমাদেরকে নিয়ে যায় অনেক যুগ পিছনে। কিংবদন্তিটি হল :

রাজা ভারমল্লের একটি বিশাল গোশালা ছিল। গোশালায় কপিলা গাই ছিল সকলের ঈর্ষার বস্তু।যেমন দুধও দিত , তেমনি তার চেহারা , হঠাৎ একদিন দেখা গেল তার দুধ দিন দিন কমে যাচ্ছে। রাজা সেই খবরের সত্যাসত্য জানার জন্য মুকুন্দ ঘোষের কাছে গেলেন , মুকুন্দ ঘোষ এ বিষয়ে সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারলেন না 'কারণ তিনিও নিজেই দাননে না কপিলা গরুর দুধ কমে যাওয়ার আসল কারণ। তাঁর মনেও একটা কৌতূহল জেগে উঠল , তিনি নিজে জানার চেষ্টা করলেন কী কারণে দিনের পর দিন এভাবে কপিলার দুধ কমে যাচ্ছে ! তাই তিনি একদিন নিজেই কপিলাকে অনুসরণ করে তার পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। এক অলৌকিক ঘটনা দেখে মুকুল ঘোষ অবাক হয়ে গেলেন ! বনের ভিতরে একটি চমৎকার কালো পাথরের মাঝখানে কপিলা গাই এসে দাঁড়ালো আর দুটো সাপ বাঁট ঝুলে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে কপিলার দুধ এমনি এমনি ওই পাথরের উপরে পড়তে লাগল ;দুধ দেওয়া হয়ে গেলে কপিলা গাই আবার ফিরে যায়। শোনা যায় রাখাল বালকেরা ঐ পাথরের মাঝখানে ধান ভেঙে খাওয়ার জন্য মাঝখানটা গর্ত হয়ে গেছে।

সেইসময়ে আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল। উত্তরাখণ্ডের যোশী মঠের মোহান্ত মায়াগিরিকে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠানো হয় নানা অঞ্চলে ; তিনি জঙ্গলের মধ্যেই থাকতেন। দিনের বেলায় শৈব ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি লোকালয়ে যেতেন আবার রাত্রিতে জঙ্গলে ফিরে আসতেন।ভারমল্ল ক্রমে ক্রমে এই সন্ন্যাসীর কথা দানতে পেরে স্বয়ং তিনি দেখা করতে আসেন। তিনি জানতে পারেন এই পাথরের মূর্তিটিই সন্ন্যাসীর আরাধ্য দেবতা এবং কপিলা এই পাথরের উপরে এসে প্রতিদিন দুধ দিয়ে যায় সে কথাও জানতে পারলেন। ভারমল্লর বাসনা হল এই শিলাটি রামনগর গড়ে প্রতিষ্ঠা করবেন ;তাঁর মনস্কামনার কথা তিনি সন্ন্যাসীকে জানালেন। সন্ন্যাসী তাঁকে সম্মতি দিলে ভারমল্ল একশ খননকারী লাগিয়ে বারোদিনের প্রচেষ্টাতেও সেই পাথরটি তুলতে পারলেন না।একদিন রাতে ভারমল্ল স্বপ্ন দেখলেন তারকনাথ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে তাঁকে বলছেন :

অকারণ কেন দুঃখ পাও -

" গয়া গঙ্গা বারণসী ব্যাপ্ত মোর মূল।

প্রতিষ্ঠিত হয় হেথা ভুবন অতুল ॥

হেথায় মন্দির করো ,করো তীর্থস্থান।

তারকেশ্বর মিটাইবেন সর্ব মনস্কাম ।।"

এই স্বপ্ন দেখার পরই রাজার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নের কথা সন্ন্যাসীকে জানালেন ;সন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুসারে জঙ্গল পরিষ্কার করে ভারমল্ল সেখানে মন্দির স্থাপন করার কাজে নিজেকে ব্রতী করলেন। তিনি সংসার জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেবতার পাদপদ্মে নিজেকে সঁপে দিয়ে সন্ন্রাসী জীবন ধারণ করলেন , তখন থেকেই তার জীবনের ব্রত হল শিবজ্ঞানে জীব সেবা।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে যখন মানুষের মন চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে , যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতে চায় সব কিছু তাদের কাছে আবেগ নয় , যুক্তিবাদী মনই প্রবল। মানুষ আধুনিকতায় শিক্ষিত হয়ে মনের গহনলোক থেকে আদিম সংস্কারকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে চেয়েছে ।কিন্তু কোথাও যেন আটকে গেছে বিশ্বাস -সংস্কারের ধাগপাশে। আসলে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ভক্তি ,বিশ্বাস এমনভাবে মিশে আছে তার থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে না হাজার চেষ্টা করেও। তাইতো যন্ত্র বিজ্ঞানের যুগে এসেও মানুষ দেবতার পায়ে ভক্তিভরে অঞ্জলি নিবেদন করেছে। যুক্তি ,তর্কের বেড়াজাল যায় ছিঁড়ে ,বৃথা হয়ে পড়ে আধুনিক ধ্যান ,ধারণা। মন্দিরের ঘন্টার অনুরণনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের স্পন্দন এক হয়ে গিয়ে মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে।

তথ্যসূত্র :

সংবাদ দাতার নাম - হৃষিকেশ দণ্ডিস্বামী মোহান্ত ,

বয়স :৭৩ বছর

বাবার ধাম – ঁজগন্নাথ দণ্ডীস্বামী

ঠিকানা : তারকেশ্বর ,রাজবাড়ি ,হুগলি , পশ্চিমবঙ্গ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : পূর্ব -রাঢ় বাংলার স্থাপত্য নিদর্শন (PURBO RARH BANGLAR STHAPOTYO NIDORSON)

গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে যা লোকসমাজের ধর্মীয় মানসিকতার সাক্ষী বহন করে আসছে অতীত কাল থেকেই। এই অধ্যায়ে কিংবদন্তি ছাড়া গড়ে ওঠা মন্দিরের উপরে আলোকপাত করা হবে। মন্দির উৎপত্তির পিছনে সব সময় যে কিংবদন্তি লুকিয়ে থাকে তা নয় , এমন অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন শৈল্পিক শ্রেণির মন্দিরের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে যত্র তত্র। এই অধ্যায়ে এই রকমই বেশ কিছু মন্দিরের কারুকার্য খচিত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হবে। মন্দির গাত্রে যেসব অলংকরণ অঙ্কিত হয় তার মধ্যে এক দক্ষ শিল্পীর গভীর নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের সাক্ষ্য ফুটে ওঠে। মন্দির গাত্রে ব্যবহৃত অলংকরণ ,ব্যবহৃত উপকরণ , কোন ধরণের চিত্রের সমাবেশ ঘটেছে তা থেকে মন্দির সৃষ্টির সমসাময়িক সমাজের বিশ্বাস -সংস্কারের দিকেরও পরিচয় পাওয়া যায় ;সামাজিক নৃতত্ত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায় মন্দিরের গঠন প্রণালী থেকে। বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু খ্যাত ,কিছু অখ্যাত মন্দির ;আয়তনে ছোটো হলেও নিপুণ অলংকরণে সজ্জিত এই অসংখ্য মন্দিররাজি বাংলার একটা নির্দিষ্ট সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক দলিল।

বাংলার গ্রামের প্রধান উপেক্ষিত ঐশ্বর্য বাংলার টেরাকোটা মন্দির। নানা রীতির স্থাপত্যে নির্মিত নানা অলংকরণে মোড়া এই মন্দিরগুলি যে বাংলার শিল্প ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অসামান্য সূক্ষ্ম কারুকাজ ও স্থাপত্য দক্ষতার যে পরিচয় এই মন্দিরগুলিতে আছে তার তুলনা নেই। দু'শো বছর আগে বাংলার প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল গ্রাম। নিরক্ষর শিল্পীরা পুরাণ ও সাহিত্যের আনাচ -কানাচ ভালোভাবেই জানতেন যার সাক্ষী পাওয়া যায় মন্দিরের গাত্র অলংকরণের মধ্যে। গ্রামের।নানান মলিন অবস্থার মধ্যে সেই ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার এরকম অসাধারণ মন্দির ।এই অধ্যায়ে পূর্ব- রাঢ় বাংললার শিল্প স্থাপত্যের বিস্তৃত পরিচয় থাকবে।

শিল্পী মনের ভাবনা আর শৈল্পিক রেখায় মিলেমিশে গড়ে উঠেছে এইসব শিল্পকলা। কালের ধাক্কায় আর আমাদের অবহেলায় তা লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে আমরা পুরাতত্ত্বের প্রাচীন নিদর্শন থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। এইসব স্থাপত্যে্য অন্তরালে লুকিয়ে আছে সমাজতত্ত্বের বীজ ; সেই সমাজতত্ত্বের বীজের আসল সত্য উদ্ঘাটনই হবে আমার লক্ষ্য।

সপ্তম অধ্যায় : স্থাপত্য ও কিংবদন্তির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (STHAPOTYO O KINGBANDANTIR BORTOMAN O BHABISHOT)

পূর্ব বাংলার নদীগুলির গতিপথ বারবার পরিবর্তিত হয়ে এখানকার মানুষের জীবনে ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকা পালন করে আসছে অতীত কাল থেকেই । সময়ের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে না পেরে বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে । পুরাতন হতে হতে অতীত আমাদের কাছে গল্পলোকের কল্পকথায় পরিণত হয়েছে । অধিকাংশ মন্দির আমাদের অযত্নে ও অবহেলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বিষাক্ত সাপ ও চামচিকির আড্ডাস্থল ।কোনো কোনো মন্দির সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে আবার কোনো কোনো মন্দির ধ্বংসের মুখে শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে আছে । আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হওয়া উচিত মন্দিরগুলিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা । এইসব মন্দির থেকে যেসব প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারি তা সমাজের সম্পদ । সামাজিক রীতি ,নীতি ,অর্থনৈতিক ,সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটও নির্ণয় করা যায় মন্দিরের স্থাপত্য রীতি থেকে ।

বাঙালি এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছে মন্দিরের ইঁটের ফাঁকে গজিয়ে ওঠা বট ,অশ্বত্থ গাছকে উপড়ে ফেলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে । আমরা অক্ষম হয়ে গেছি তাই চোখের সামনে এক -একটা মন্দির ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা নীরব সাক্ষী হয়ে থাকছি আমাদের যেন কিছু করার নেই ! আমরা নির্লিপ্ত ভাবে এড়িয়ে চলে যাই , নিজদের নিয়ে ভাবতে গিয়ে বৃহত্তর সমাজের কথা ভুলে যাচ্ছি ক্রমশঃ । আমাদের চিন্তাভাবনা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাই বৃহত্তর স্বার্থের কথা আমরা প্রায়ই ভুলতে বসেছি । একদিকে যেমন আছে আমাদের ঔদাসীনতা ,অপরদিকে আছে অর্থনৈতিক সংকোট । এইসমস্ত পুরাকীর্তির শিল্পসৌন্দর্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হলে চাই আরো প্রয়াস । ব্যক্তিগত প্রয়াসে তা সম্ভব নয় ; যৌথ প্রচেষ্টায় আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই শিল্পকলাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে । অর্থনৈতিক অভাব আর রক্ষণাবেক্ষণের লোকের অভাবে কালের অমোঘ নিয়মে ধ্বংসের মুখে পর্যবসিত হচ্ছে বেশ কিছু স্থাপত্যের নিদর্শন । অর্থানুকূল্যের জন্য অবশ্যই সরকারি অনুদানের যথেষ্ট প্রয়োজন ।য়পুরাতত্ত্ব বিভাগএও একাজে এগিয়ে আসতে হবে এই শিল্পকলাগুলিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে । তা না হলে এই সব স্থাপত্য সমাজের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুর মতোই অবলুপ্ত হয়ে যাবে । আমার কি পারি না লোকশিল্পীদের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য দিতে ?

লোকসমাজের বুক থেকে অধিকাংশ মন্দির যেমন কালের ধাক্কায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।,তেমনি কিংবদন্তিও আজ বিস্মৃতির অতলে।তলিয়ে যাচ্ছে । সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে লোকসমাজের জীবনের ছন্দ।গেছে ছিঁড়ে । আধুনিকতার ধাক্কায় পরিবর্তন হচ্ছে লোকমন; লোকসমাজের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অন্তরের মধ্যে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হলেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই প্রবাহ কিছুটা রুদ্ধ হয়ে গেছে । পরিবর্তন হতে হতে এমন একটা জায়গায় আটকে গেছে সেখান থেকে আর।নতুন অরে কিংবদন্তি গড়ে উঠছে না । লোকসমাজের বুকে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তা আমাদের পিতামহ -প্রপিতামহদের সৃষ্টি ।

আমাদের পিতামহ -প্রপিতামহরা তাঁদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা করতে পারতেন না । এই ফাঁকটা তাঁরা পূরণ করতেন তাঁদের কল্পনাশক্তি দিয়ে । যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন ধরণের লোককথার সৃষ্টি । সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যত প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল ,ততই স্বকীয়তা বোধ আর আত্ম প্রত্যয়ও বাড়তে লাগল ।আত্মপ্রত্যয় বুদ্ধি ও দৈবনির্ভরতা বিষমাপাতিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ।

কিংবদন্তি মুখে ,মুখে ছড়িয়ে পড়ে এক প্রজন্মের কাছ থেকে অন্য প্রজন্মের কাছে সময়ের হাত ধরে । যন্ত্র সভ্যতার ধাক্কায় সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়ে নবরূপে গড়ে উঠেছে । গ্রাম ক্রমশঃ পরিণত হচ্ছে আধা শহরে আর সেইসঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে লোকায়ত সমাজ জীবনের আঙ্গিক । গ্রামীণ সমাজের বুক থেকে একটু একটু করে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস -সংস্কার ,রীতিনীতি । কিংবদন্তি নতুন কোনো বার্তা পৌঁছে দেয় না নবপ্রজন্মদের কাছে । ইন্টারনেটের যুগে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় সমাজ , সভ্যতার অগ্রগতিও সামিল হয়েছে ইঁদুর দৌড়ে । বর্তমান প্রজন্মের কাছে কিংবদন্তি মানেই গাল গল্পে ভরা অন্তঃসারশূন্য ভিত্তিহীন ,যুক্তিহীন অবাস্তব । একবিংশ শতাব্দীতে সব কিছু যুক্তির নিরীখে বিচার করতে শিখেছে নবপ্রজন্ম ;এখন বিনোদনের অনেক উপায় সেইসব ফেলে কেউ আর পিছনে ফিরে যেতে চায় না মানুষ পাড়ি দিয়েছে দূর গ্রহলোকে ।কিংবদন্তিও মানুষের মন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই অধ্যায়ে স্থাপত্য ও কিংবদন্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করব ।

উপসংহার (CONCLUSION)

নগর জীবনের যান্ত্রিক জটিলতায় জীবনের সহজ ,সুন্দর রূপটির কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। লোকসংস্কৃতি সেই জীবনের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে।আমাদের জাতীয় ইতিহাস নির্মাণে এর চর্চা গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির সেইদিক তুলে ধরা হবে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী স্বীকার করে আমি আমার নিবন্ধটি শেষ করব। বিষয়টি বিদগ্ধজনের নজর কাড়লে নিজেকে ধন্য মনে করব।

এই গবেষণা কর্মে বিনোদ বিহারী মাহাত কয়লাঞ্চল ইউনিভার্সিটির (ঝাড়খণ্ড , ধানবাদ) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মানস আচার্য মহাশয়ের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাকে একাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন।য়েছাড়াও বিভিন্ন অধ্যাপক মণ্ডলীও আমাকে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অকৃত্রিম ভাবে সাহযি করছেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যেসব গ্রন্থ আমার গবেষণা কাজে সহায়ক হবে তার লিপিবদ্ধ থাকবে। এ বিষয়ের মধ্যে মনোযোগ ও নিজেকে অভিনিবেশ করার চেষ্টায় কোনো কার্পণ্য করব না। তবুও অনুধাবন জনিত যদি কোনো ত্রুটি -বিচ্যুতি যদি আমার নিবন্ধ রচনায় থাকে তার জন্য আমি বিদগ্ধজনের কাছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিপাতের প্রত্যাশী। বিষয়টি যদি বুধমণ্ডলীর সন্তুষ্টি বিধান করে তাহলে শ্রম সার্থক মনে করব।

গ্রন্থপঞ্জী (REFERENCE)

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল	প্রকাশক	ঠিকানা
(১) তারাপদ সাঁতরা	পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ	১৯৯৮	পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী	কলকাতা
(২) দেবল দেবশর্মা	রাঢ় বাংলার ইতিবৃত্ত	২০১৮	দে'জ পাবলিশিং	কলকাতা
(৩) দেবলা মিত্র	হুগলি জেলার পুরাকীর্তি	১৯৮৮	তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ	পশ্চিমবঙ্গ
(৪) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	হুগলি জেলার পুরাকীর্তি	১৯৯৩	বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ	কলকাতা
(৫) পল্লব সেনগুপ্ত	লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ	১৪০৯	এশিয়াটিক সোসাইটি	কলকাতা
(৬) পল্লব সেনগুপ্ত	লোককথার অন্তর্লোক	২০০০	লোকসংস্কৃতি গবেষণা	কলকাতা
(৭) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হুগলি জেলার সেকাল একাল	১৪২১	দে'জ পাবলিকেশন	কলকাতা
(৮) বিনয় ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	১৯৭৮	প্রকাশ ভবন	কলকাতা
(৯) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সংবাদপত্রে সেকালের কথা	১৯৪৯	------	কলকাতা
(১০) ভূপতিরঞ্জন দাস	পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন	১৩৮৫	শরৎ পাবলিশিং হাউস	কলকাতা
(১১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার ইতিহাস	১৯১৭	--- ----	কলকাতা

(১২) রাধাগোবিন্দ বসাক বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনা ১৯৫৮ ---- কলকাতা

(১৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৭৩ -------- কলকাতা

(১৪) সুধীর কুমার মিত্র হুগলি জেলার ইতিহাস ১৯৭৫ রামকৃষ্ণ মিত্র কলকাতা

(১৫) হিতেশ রঞ্জন সান্যাল বাংলার মন্দির ২০১২ এস.পি . কমিউনিকেশন কলকাতা